ফিক্সড ফোন বৈষম্যের শিকার

জাকারিয়া স্বপন

বাংলাদেশে কাজ করতে গিয়ে নিত্যদিন হাজারটা সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসে কাজ করতে কেমন লাগছে?

তাদেরকে বলি, আমেরিকা হলো আমেরিকা; আর বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ। এ দুটোর তুলনা করা ঠিক হবে না। এরা দুটো এক মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

আমি ধরেই নিয়েছি, বাংলাদেশে কাজ করতে গিয়ে সমস্যা হবেই। আবার এটাও বিশ্বাস করি, সেই সমস্যাটির সমাধানও একসময় হবে। আর যদি সমাধান না হয়, তাহলে এক সময় আসবে আমরা থেমে যাবো; হয়ে যাবো একটা মৃত সাগর। সাগরের নিচে বিশাল জঞ্জাল-আবর্জনা জমে গিয়ে একটা সাগরেরও মৃত্যু হতে পারে। আমি আপাতত বাংলাদেশের সেই ধরনের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি না। উপরন্তু সেটা ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে। মানুষ আরো বেশি এন্টারপ্রেনর হচ্ছে। যে সমাজে এন্টারপ্রেনরশিপ থাকে, সেখানে মুক্তি না এসে পারে না। যেমন সাপ্তাহিক ২০০০-এ ফিক্সড ফোনের ওপর প্রতিবেদন ছাপা হবার পর অনেক কিছু সহজতর হয়েছে। এর অর্থ হলো, আমরা থেমে নেই। আর থেমে না থাকার অর্থই হলো বেঁচে থাকা, এগিয়ে চলা। হতাশ হবার মতো এখনো তেমন কিছু ঘটেনি।

কেউ স্বীকার করুক বা না করুক এটা সত্যি যে, দেশে মোবাইল কোম্পানিগুলো একটা জোয়ার এনে দিয়েছে। দেশের শিক্ষিত মানুষেরা চাকরি পাচ্ছে; প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং বিদেশ থেকে প্রচুর যোগ্য লোক দেশে ফিরে কিছু একটা করতে পারছেন। এর পাশাপাশি প্রতিটি ফোন দেশের অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে ভ্যালু সংযোগ করে। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে। আমেরিকার অর্থনীতি এতো শক্তিশালী, তার একটি বড় কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টাকার দ্রুত প্রবাহ। টাকা যত বেশি দ্রুত হাত বদল হয়, অর্থনীতি তত শক্তিশালী হয়। রুগ্ন

অর্থনীতিতে টাকার প্রবাহ কমে যায়।

টাকার দ্রুত প্রবাহের জন্য প্রথম যে শর্তটি আছে, সেটা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা। আপনি চিন্তা করে দেখুন, মানুষের মাঝে যখন বাজারের ধারণা ছিল না, রাস্তাঘাট ছিল না, তখনকার অর্থনীতি কেমন ছিল; আর বর্তমান অর্থনীতির রূপ কেমন? টাকার প্রবাহের জন্য রাস্তাঘাট তৈরি হলো। তাতে ট্রাংজেকশন করা সহজতর হলো। তারপর মানুষ সেই রাস্তাঘাটের পাশাপাশি তৈরি করলো ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা; অর্থ্যাৎ টরেটক্কা, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট। তাতে অর্থনীতি আরো বেশি সচল হয়ে ওঠে। বর্তমান ইন্টারনেট যুগে, সেটা আরো বেশি সচল এবং জটিল হয়ে পড়েছে। এতো কিছু বলে যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করছি, তা হলো ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থাই বর্তমান অর্থনীতিকে ধরে রাখে এবং মানুষ বিজ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। টেলিফোন হলো তার মূল ভিত্তি।

দেশে বেশ কয়েক বছর ধরে মোবাইল ফোনের বিপ্লব হয়েছে। এবারে আসছে ফিক্সড ফোন। যেহেতু এই প্রথম এটা দেশে ব্যাপক আকারে আসতে যাচ্ছে, তাই অনেক নিত্যনতুন সমস্যার আবির্ভাব হচ্ছে যেগুলো গ্রাহকদেরকে ভোগাবে।

টেলিফোন সেটের ওপর কর

বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন ফোন কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, এরা খুব বেশি মূল্যে কল চার্জ নিচ্ছে। এর একটি কারণ হয়তো, কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগ খুব তাড়াতাড়ি তুলে নিতে চান এবং পাশাপাশি মুনাফার ব্যাপারটি তো রয়েছেই। তবে এটা সবসময়ই বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গ্রাহকরা যদি এটা এফোর্ড করতে না পারতেন, তাহলে তো এতো বেশি মূল্য নিতে পারতো না। আবার বাজারের দাবিতেই এটা এক সময় কমে যাবে।

তবে ফিক্সড ফোন কোম্পানিগুলো কিন্তু সেখানে একটা বৈপ-বিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। তাদের কলরেট কিন্তু অনেক কম; বিটিটিবির কল চার্জের মতো কিংবা তারচেয়ে কম। কিন্তু পাশাপাশি একটা বিষয় চলে আসে; তাহলো টেলিফোন সেটের ওপর কর।

বর্তমান টেলিফোন সেটগুলো হলো ওয়্যারল্যাস বা তারবিহীন। বাসায় ফোন পেতে আর লাইনের ঝামেলায় পড়তে হবে

না। কিন্তু সেই টেলিফোনগুলোর মূল্য সাধারণ টেলিফোনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশ বেশি এবং এর ওপর কর ধার্য করা আছে শতকরা ৫২ ভাগ। ফলে পাঁচ হাজার টাকার একটি টেলিফোন সেট হয়ে যাচ্ছে সাড়ে সাত হাজার টাকার বেশি। এতো টাকা দিয়ে একটি টেলিফোন কিনতে নিশ্চয়ই মানুষের কষ্ট হবে।

কিন্তু সরকার ভেবে দেখছে না, এই ২৫০০ টাকা ট্যাক্স না নিলে, পরবর্তীতে কল-চার্জের ভ্যাট থেকে সরকার আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে। এবং পাশাপাশি অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারে। সরকার যদি বিষয়টি ভেবে দেখে, তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই টেলিফোন পেতে পারেন; এবং কম মূল্যে কথা বলার সুযোগ পাবেন। ভারত এবং শ্রীলঙ্কা এটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে। এই ওয়্যারলেস ফোনের ওপর কর (ট্যাক্স) মাত্র তিনশত টাকা।

ফিক্সড টেলিফোন যেহেতু কম মূল্যের ফোন, সেক্ষেত্রে এর সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলোও কম মূল্যের হওয়া উচিত।

তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, ফিক্সড টেলিফোনের যন্ত্রপাতি কিন্তু অন্য যেকোনো ফোনের মতোই দামী। কিন্তু মানুষ আশা করে, এটা দিয়ে কম মূল্যে কথা বলা যাবে। কিন্তু মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো যে ধরনের খরচ করে, এদের খরচও একই রকম। কিন্তু কল-রেট অনেক কম। সেই দিক থেকে দেখলে এই ব্যবসা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। সেজন্য বিদেশী কোম্পানিগুলো এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেনি।

এক্সেস কোড সমস্যা

পুরো বিশ্বে টেলিফোন নাম্বার বসানোর একটি নিয়ম আছে। সেই নিয়মানুযায়ী এই বিশ্বের প্রতিটি টেলিফোনের নাম্বার ইউনিক। যে কারণে পৃথিবীর যেকোনও টেলিফোন থেকে আরেকটি ফোনে পৌঁছানো যায়। সেই ফরম্যাটটি হলো এমন- কান্ট্রি কোড + এরিয়া কোড + ফোন নাম্বার। যেমন ঢাকা শহরের একটি টেলিফোনের নাম্বার হলো, ৮৮০-২-গ্রাহকের নাম্বার। উদাহরণস্বরূপ সাপ্তাহিক ২০০০-এর টেলিফোন নাম্বার হলো ৮৮০-২-৯৩৫০৯৫১। এখানে বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড হলো ৮৮০, ঢাকার এরিয়া কোড হলো ২ এবং ২০০০-এর ঢাকার নাম্বার হলো ৯৩৫-০৯৫১। আমরা অনেক সময় নাম্বারটি এভাবে লিখি ৮৮-০২-৯৩৫০৯৫১। এটা সঠিক রীতি নয়। যেহেতু ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় ফোন করতে ০২ দিয়ে করতে হয়, তাই আমরা অনেক সময় ওভাবে লিখি। আসলে ০ (শূন্য) হলো এন.ডবলিও.ডি (নেশন ওয়াইড ডায়ালিং) কোড। ঠিক একই

ঢাকা শহরের জন্য বিগত সরকারের আমলে একটি কোম্পানিকে মনোপলি লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। তারা এখন কোর্ট-কাচারি করে তাদের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। কিন্তু দেশের আইন এটাকে সমর্থন করে না। দেশের আইনানুযায়ী কোনও প্রতিষ্ঠানকে মনোপলি দেয়া যাবে না। কিন্তু এখন সেটাই হচ্ছে। অতি সম্প্রতি সেই কোম্পানি আইনি লড়াইয়ে হেরে গেছে। এখন কবে ঢাকা শহরের মানুষ এই ফোন সেবা পাবে সেটাই দেখার বিষয়

ভাবে ০০ (শূন্য শূন্য) হলো আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে ফোন করতে এই কোড চেপে তারপর অন্য নাম্বার দিতে হয়। কিন্তু আবার আমেরিকা থেকে সেই দেশের বাইরে ডায়াল করতে হলে চাপতে হয় ০১১। একেক দেশ একেকভাবে এই ডায়ালিং কোডটি নিজেদের মতো ঠিক করে নিয়েছে। কিন্তু তার সাথে কান্ট্রি কোডের কোনো সম্পর্ক নেই।

ফোন নাম্বার লেখার বা ডায়াল করার এই নিয়ম যেকোনো ফোনের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলাদেশে যখন মোবাইল টেলিফোন লাইসেন্স দেয়া হলো, তখন এই নিয়ম ভাঙা হয়েছে। তারা এই নিয়মের আওতায় গ্রাহকদের টেলিফোন দেননি। তারা প্রতিটি টেলিফোন কোম্পানি একটি করে আলাদা কোড নিয়ে নিয়েছেন (সিটিসেল ১১, গ্রামীণ ১৭, একটেল ১৮ ও বাংলালিংক ১৯)। এবং এমন একটি ধারণা দেয়া হয়েছে যে, প্রচলিত কোডিং নিয়মটি বিটিটিবির। আসলে কিন্তু তা নয়। বিটিটিবি দেশের সর্বপ্রথম টেলিফোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং তারা যাবতীয় নিয়ম মেনেই চলেছেন। কিন্তু মোবাইল কোম্পানিগুলো সেটা মানেননি। এমনকি বিটিটিবির টেলিটকও সেটা না মেনে কোড নিয়েছে ১৫। তাদের নেটওয়ার্কে কল করার সময় আগে একটি শূন্য দিয়ে ডায়াল করতে হয়। অর্থাৎ ০১৫, ০১৭, ০১৮ ইত্যাদি। এরা এরিয়া কোড ব্যবহার করেন না। নিয়ম ভাঙার নিশ্চয়ই একটি কারণ ছিল। প্রধান যে যুক্তিটি এখানে দেয়া হয় সেটা হলো, এরা হলো মোবাইল; তাই এদেরকে এরিয়া কোড ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমেরিকা হলো টেলিফোন শিল্পের প্রবর্তক ও বাহক। খেয়াল করুন, তাদের কান্ট্রি কোড হলো ১ (আমরা ডায়াল করি, ০০১)। তারা ১ নম্বরটি নিজেদের জন্য ব্যবহার করেছে। সেই আমেরিকাতেও এই নিয়মটি নেই। ওখানকার মোবাইল টেলিফোনের নাম্বার আর ফিক্সড ফোনের নাম্বার ফরম্যাট একই রকম। নাম্বার দেখে আলাদা করার উপায় নেই। যেমন আমেরিকাতে আমার বাসার ফিক্সড ও মোবাইল নাম্বারের প্রথম কয়েকটি ডিজিট উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো ১-৪০৮-২৪৮-**** এবং ১- ৪০৮-৪৭৬-****। ১ হলো কান্ট্রি কোড, ৪০৮ হলো ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান হোজে/সান্টা-ক্লারা শহরের এরিয়া কোড। একজন মোবাইল গ্রাহক যখন তার শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবেন, তখনও সেটা কাজ করবে। কিন্তু ওটা যে সান্টা-ক্লারা শহরের নাম্বার সেটা বুঝা যাবে নাম্বার দেখেই। একই ভাবে নিউইয়র্কের এরিয়া কোড ৭১৮, টেক্সাস অস্টিনের কোড ৫১২।

বাংলাদেশে ঢাকার কোড যেমন ২ (০২ নয়), তেমনি চট্টগ্রামের কোড ৩১, সিলেটের কোড ৮২১, ময়মনসিংহের কোড ৯১ ইত্যাদি। কিন্তু মোবাইল ফোনগুলো যেহেতু নিয়মটি মানেনি, তাই বুঝার উপায় নেই, এটা কি চট্টগ্রামের মোবাইল নাকি ঢাকার মোবাইল।

তবে এই নিয়ম ভাঙার জন্য প্রযুক্তিগত একটি সমস্যা ছিল বটে। বিটিটিবি এই সব মোবাইল কোম্পানির নেটওয়ার্কের জন্য তাদের সুইচে এতোগুলো এরিয়া কোড হয়তো দিতে পারতো না। বাংলাদেশে প্রায় চারশ'র মতো এরিয়া কোড আছে।

কিন্তু বৈষম্যমূলকভাবে এখন ফিক্সড ফোন কোম্পানিগুলো এই সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে। তাদেরকে কোনও এক্সেস কোড না দিয়ে প্রচলিত এরিয়া-কোড ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, এরিয়া কোডের সাথে মোবাবিলিটি-র কোনও সম্পর্ক নেই। এরিয়া কোড দেয়ার পরও একজন গ্রাহক মোবাইল হতে পারে; এই

শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতে পারেন। এখন এতোগুলো ফোন কোম্পানির জন্য রাউটিং দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সবাই। এবং দেখা যাবে, অনেক এলাকা থেকে অনেক গ্রাহক সব টেলিফোনে সংযোগ নাও পেতে পারেন।

যেহেতু নিয়ম মেনে কাজটি প্রথম থেকে করা হয়নি, তাই এখন যখন সেটা করতে যাওয়া হচ্ছে, তখন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রতিটি ফোন কোম্পানিকে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হবে, যা অনেক সময়সাপেক্ষ এবং ঝক্কিপূর্ণ। সমস্যাটির সবচে প্রকট যে বিষয় তাহলো রাউটিং। একটু খুলে বলা যাক।

যেমন গ্রামীণফোনকে র‍্যাংকসটেলের জন্য তাদের সুইচে প্রায় ৪০০ এন্ট্রি দিতে হবে। এমন কোম্পানি আছে ২০টির মতো। তাহলে গ্রামীণকে প্রায় ৮,০০০ এন্ট্রি দিতে হবে, যা রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জটিল। একইভাবে প্রতিটি কোম্পানিটিকে এন্ট্রি দিতে হবে। কিন্তু প্রতিটি ফোন কোম্পানিকে যদি একটি করে অপারেটর কোড দেয়া হতো, তাহলে খুব সহজেই এই সমস্যাটির সমাধান হতে পারে।

সিমকার্ড ব্যবহার

বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন হঠাৎ করেই একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, এই ফিক্সড ফোনগুলো সিম কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের যুক্তি হলো, এই সিম (বা রিম) ব্যবহার করতে দিলে ফিক্সড ফোন কোম্পানিগুলো মোবাইল সেবা দিতে শুরু করবে। কিন্তু কেউ বুঝতে চাইছেন না যে, সিম/রিমের সাথে মোবাইলের কোনও সম্পর্ক নেই। আপনারা জানেন, দীর্ঘদিন সিলিসেল রিম কার্ড ছাড়াই মোবাইল ফোন সার্ভিস দিয়েছে। এই কিছুদিন হলো তারা রিম কার্ড চালু করেছে। এর অর্থ হলো, রিম কার্ড ছাড়াও মোবাইল সেবা দেয়া যায়। আবার রিম কার্ড থাকলেও মোবাইল সেবা বন্ধ করে রাখা যায়। এটা হলো লাইসেন্সের বিষয়। লাইসেন্স-এর আওতায় কে কি সেবা দিতে পারবে, সেটা নিয়ে কথা হতে পারে। কিন্তু কোনও প্রযুক্তিকে তো এভাবে আটকে রাখা ঠিক নয়। রিম কার্ড হলো আধুনিক প্রযুক্তি। প্রতিষ্ঠানগুলোও রিম কার্ডসহ টেলিফোন সেট বেশি প্রস্তুত করছে। একটা জুজুর ভয়ে চমৎকার একটি প্রযুক্তিতে এভাবে আটকে দেয়ার কোনও অর্থ হতে পারে না।

ঢাকা শহরের মানুষ বঞ্চিত

বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) পুরো দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক লাইসেন্স প্রদান করেছে। তবে ঢাকা জোনের জন্য একটি কোম্পানির সাথে আইনি জটিলতার কারণে নতুন করে আর কাউকে এখন পর্যন্ত লাইসেন্স দেয়া হয়নি। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান তাই চারটি অঞ্চলের জন্য লাইসেন্স নিয়েছে; কেউ কেউ একটি অঞ্চলের জন্য লাইসেন্স নিয়েছে। এবং ঢাকা শহরের মানুষ এই সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

ঢাকা শহরের জন্য বিগত সরকারের আমলে একটি কোম্পানিকে মনোপলি লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। তারা এখন কোর্ট-কাচারি করে তাদের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। কিন্তু দেশের আইন এটাকে সমর্থন করে না। দেশের আইনানুযায়ী কোনও প্রতিষ্ঠানকে মনোপলি দেয়া যাবে না। কিন্তু এখন সেটাই হচ্ছে। এবং দেশের মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে। অতি সম্প্রতি সেই কোম্পানি আইনি লড়াইয়ে হেরে গেছে। এখন কবে ঢাকা শহরের মানুষ এই ফোন সেবা পাবে সেটাই দেখার বিষয়। আমি সবচে বেশি অবাক হচ্ছি, ওই কোম্পানির পক্ষে এমন একটি অনৈতিক বিষয়ে আইনি লড়াই লড়ছেন এমন সব আইনজীবী যারা প্রায়শই দেশের কথা বলেন, দেশের মানুষের কথা বলেন এবং মানুষের অধিকারের কথা বলেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনে নতুন ব্যবস্থাপনা এসেছে। এবং এখন হয়তো আশা করা যায়, এই সমস্যাটির একটি সঠিক সমাধান হবে।

ই-মেইল ঃ zs@rankstel.net